SUHEL

Gargi Bhattacharya

COPYRIGHTED MATERIAL

সুহেল

গার্গী ভট্টাচার্য

এই বইটি আমি মিঠুনদার জন্য লিখছি। এতবড়
সুপার স্টার হয়ে গেলেও যিনি ভেজা মাটির সুগন্ধ
এবং সরল মানুষকে ভুলে যাননি।

(মিঠুন চক্রবর্ত্তী , অভিনেতা)

If you judge people you have

No time to love them .

--Mother Teresa

My website :

www.gargiz.com

সুহেল

সুহেল একজন যুবকের নাম যে থাকে নীল দ্বীপে । এই নীল দ্বীপ ভারতের পূর্ব দিকে । এই এলাকায় অনেক মানুষ বাস করে । এরা স্বাধীনতার আগে

বৃটিশ সরকারের দ্বারা এই অঞ্চলে প্রেরিত হয় কয়েদী হিসেবে । তাদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতীয়রাই থাকতো । পরে দেশ স্বাধীন হলে এরা এখানেই বাস করতে শুরু করে । বেশ কিছু লোকাল অধিবাসী যাদের লোকে আদিবাসী বলে তারাও আছে । এরকম স্থানে বেশ কটি দ্বীপ আছে । গোটা বারো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ । এবং প্রতিটির অপরূপ নাম ও মাহাত্ম্য আছে । কিছুটা প্রাকৃতিক কারণে আবার কিছুটা ভৌগোলিক কারণে এই নামকরণ হলেও নামের সাথে যেন হুবুহ মিলে গেছে

দ্বীপের চেহারা ।

সুহেল যেমন নীল দ্বীপে বাস করে সেরকম আরো ১১টা দ্বীপ হল প্রবাল দ্বীপ , সবুজ দ্বীপ ,

লাল দ্বীপ , পাহাড়িয়া দ্বীপ, লাভা দ্বীপ ,আগুন দ্বীপ , শঙ্খ দ্বীপ , ঝিনুক দ্বীপ , লাল কাঁকড়া দ্বীপ , জাহাজডুবী দ্বীপ ও সোনালি দ্বীপ ।

তবে প্রতিটি দ্বীপই বেশ দূরে দূরে ।

এইসব দ্বীপের ইতিহাস ঘাঁটলে নামের সাথে মিল পাওয়া যায় । যেমন নীল দ্বীপে নীল পাথরের ও ঝিনুকের ছড়াছড়ি । প্রবাল দ্বীপে প্রবাল ভর্ত্তি ।

লাল দ্বীপে লাল লাল বুনো গাছ যা রাঙা ফুলে ফুলে ভরে থাকে সবসময় । মনে হয় যেন সারাটা দ্বীপে কেউ আবীর ছড়িয়ে রেখেছে ।আবার এই এলাকায় সব পথঘাট ফুলের পাপড়ির ছোঁয়ায় সর্বদাই লাল লাল হয়ে থাকে ।

পাহাড়িয়া দ্বীপ, টিলায় ভর্ত্তি ।লাভা দ্বীপ নাকি সেই কোন কালে লাভা দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিলো । আগুন দ্বীপে প্রায়ই দাবানল লাগে । বনে ও তারপর ছড়িয়ে

পরে ক্ষেতখামারে । শঙ্খ দ্বীপে মেলে শাঁখ , প্রচুর ও সুন্দর সুন্দর রং এর ও গঠনের ।

ঝিনুক দ্বীপেও এমনই হয় । লাল কাঁকড়া দ্বীপে হলুদ সমুদ্র সৈকতে লাল লাল কাঁকড়া হেঁটে চলে বেড়ায় আর জাহাজডুবী দ্বীপে নাকি সমুদ্রের ঢেউ এর ঘূর্ণনে প্রায়শই ছোট বোট ও লঞ্চ ডুবে যায় বা যেতো । আর সোনালি দ্বীপে খুব রোদ আর সূর্যের কিরণের মাখামাখি । নীল জল ও দূরন্ত ঢেউ এর মাঝে অসাধারণ এই অনাঘ্রাতা স্বর্গ রাজ্য-- সোনালি দ্বীপ ।

এই দ্বীপে এক জাতের পেঙ্গুইন পাওয়া যায় যাদের সাইজ এই ১ ফুট হবে । ওদের পরী পেঙ্গুইন বলে । তারা সারাটা দিন সমুদ্রে মাছ ধরে খায় এবং সাঁঝ হলে এক এক করে সার দিয়ে এসে বালির ঢিবিতে অথবা জংলী গাছের নীচে কিংবা কোটরে ঢুকে রাত কাটায় । ভারি সুন্দর লাগে । অনেকে বলে ওদের ডানা দুটো ছোট করে দিলে হাঁসের মতন লাগবে ।

এদের দেখতে অনেক মানুষ এখানে আসে ।

মানুষ যেমন একটা নির্দিষ্ট উচ্চতার না হলে নর্মাল মানুষের মাপকাঠিতে আসেনা সেরকম পেঙ্গুইনের ক্ষেত্রে কিন্তু ওদের উচ্চতাই ওদের দাম বাড়িয়েছে ।

এত কম উচ্চতা বলেই ওদের ঘিরে গড়ে উঠেছে এক বিরাট ইন্ডাস্ট্রি । কতনা ভ্রামণিক আসছে ওদের দেখতে কারণ ওরা হল খুবই সুইট্ ।

সেলেব । সেলিব্রিটি পক্ষী নাকি জলের মক্ষী ?

সবচেয়ে দূরে হল নীল দ্বীপ ।

এখানে ধনী ব্যাক্তিরা থাকে । তুলনামূলক ভাবে ।

আমাদের গল্পের মূল চরিত্র সুহেল নামের এই ছেলেটি এই দ্বীপে এসে বসবাস করছে অনেকদিন হল । তার বাড়ির মানুষ চায় সে বাসায় ফিরে যাক কিন্তু সে যাবেনা কোনো মতেই । তারাও নাছোড়বান্দা । কিন্তু কেন সে যাবেনা আপনজনের কাছে যাদের সাথে তার সম্পর্ক মধুরই আছে আর তাদের জন্য রাতের বেলায় শুয়ে সে কাঁদে ?

কারণ সুহেলের মতন ছেলে বুঝি আজকাল আর হয়না । তার মাকে মানুষ এত অপমান করেছে যে এই ছেলে তার দেবীর মতন মায়ের সামনে গিয়ে আর দাঁড়াতে পারবে না । এমনই মনে করে সে ।

কেন অপমান করেছে ?

কোনই কারণ নেই ।

মাকে তারা চেনেই না ।

তাহলে ? এরা কেমন লোক ?

তাদেরই গল্প শোনাবার জন্য আমি এই কাব্য রচনা করতে বসেছি ।

মন দিয়ে শোনো তোমরা ।

সুহেলের মায়ের নাম সতী । ৪ ফুটের থেকে কম উচ্চতার একজন অসম্ভব মিষ্টি মুখের এই রমণী যার পুরো নাম সতী বিশ্বাস । আচ্ছা তাকে কেমন দেখতে ?

যদি বলি পুণম ধীঁলোর মতন ? একদম সেরকম ।

ফর্সাও বটে । তবে খাটো । মাথায় একঢাল চুল । কালো । লম্বা বেণী করা । মুখে সর্বদা হাসি । এমন হাসিখুশি মানুষ কি কখনো মন্দ হতে পারে ? তাও অচেনা মানুষের কাছে ?

তাহলে খুলেই বলি । আসলে দুনিয়াতে এমনসব মানুষ আছে যারা দেখতে মানুষের মতন হলেও আসলে মনের দিক থেকে দানব । অথবা অসুর ।

সাহেবরা এদের বলে নার্ক (নার্সিসিস্ট) অথবা চরম হিংস্র প্রকৃতির জীব । এরা নিজেদের সুবিধের জন্য যেকোনো মানুষকে অথবা পশু পক্ষীকে পিষে দিতে কার্পণ্য করেনা আর তার জন্য যত নিচেই

নামতে হোক না কেন নেমে যায় ।

এরকমই কিছু মানুষ সুহেলের দেবীর মতন মাকে নিয়ে এমন কুৎসা রটায় যাতে করে যুবকটি আর তার জন্ম দ্বীপে পা রাখতে চায়না ।

তাহলে কাহিনী শুরু হোক্ ।

হিন্দোল রায় নামক এক বাঙালী বিজ্ঞানী একটি ল্যাবরেটরিতে মানুষের জন্য গো প্লাস এষণা করে একটি ওষুধ বা পিল বার করতে চলেছে যাতে করে যৌবন ধরে রাখা যায় । এই ল্যাবে কাজ নিয়েছে সুহেল । হিসেবপত্র দেখে সে ।

গল্প শুরু এখান থেকেই । এখানে ওরা ভোট নেয় যে এই গবেষণা করা উচিৎ কিনা সেই বিষয়ে । তাতে সুহেল নেগেটিভ ভোট দেয় আর তাতেই গোলমাল পাকে ।

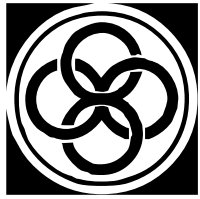

সুহেল অনেক দূরে থাকলেও তার একটি অংশ তার মায়ের কাছেই পড়ে আছে । সে নিজেও জানেনা সেটা । কারণ তার মায়ের বক্তব্য হল যেই রমণী তাকে জন্ম দিয়েছে , দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করেছে , সেই মা তার মুখ দেখলেই বুঝতে পারে দু:খ পাচ্ছে কিনা, ক্ষিদে পেয়েছে কিনা কারণ সে হল তার মায়েরই একটি দেহাংশ যে বড় হয়ে গেছে কাজেই হয়ত তারা একই সাথে নেই কিন্তু তাদের আত্মারা যুক্ত আছে আর মনে মনে তারা সবসময়ই বাঁধা । মায়েরা কখনো সন্তানের থেকে দূরে যেতে পারেনা । দৈহিকভাবে দূরত্ব থাকলেও অন্তরে তারা সবসময়ই মায়ের আঁচলেই

শুয়ে থাকে । মা তাদের রক্ষা করে ও লালন পালন করে চলে সারাটা জীবন যতদিন বেঁচে থাকে ।

বাবা ও মা যতদিন জীবিত থাকেন সন্তানের মঙ্গল চান ।

কাজেই এই সুহেল হল সুহেলের ছায়া । বা প্রতিফলন । হয়ত সুহেলের মতন তীব্র নয় তার জ্যোতি কিন্তু কোমলতায় সে মায়ের ছোট্ট সুহেল , শিশু , ছোট ছোট হাতে যে পেছন থেকে মাকে জড়িয়ে ধরে ডেকে ওঠে আধো আধো স্বরে , মাম্মা বা মাম্‌মাম্‌ ।

সুহেলেকে তার মা বলেছিলো বাড়ি থেকে আসার সময় যে **বাবা তুমি যাচ্ছে। আর সাথে করে আমার আআর কিছুটা অংশ নিয়ে যাচ্ছো ।**

আসলে প্রকৃত যেই সুহেল সে হল সুহেলের আলো বা রক্ত মাংসের অংশটা । আর মায়ের কাছে রয়েছে তার ছায়াটা । এই দুই সত্ত্বাকে নিয়ে আমার রচনা ।

অত্যন্ত খাটো একজন নারী হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে করতে পারা ও গর্ভ ধারণ করে সুস্থ , সুন্দর এক যুবকের মা হতে পারা-- যে আজকের দুনিয়ায় একজন সাচ্চা পুরুষ হয়ে উঠেছে খুব একটা সহজ নয় ।

ওদের বাসাটা খুব সুন্দর । ওর বাবা কাজ করতো মিনি জাহাজে । মানে স্টিমারে । স্টিমারের সারেং । বা কাপ্তান । বা পাইলট । ভদ্রলোক খুবই দিলদরিয়া । বহুদিন এই দ্বীপে আছেন । বাঙালী কিন্তু সবার সাথেই মেলামেশা করেন । কোন কালে তার পূর্বজরা এখানে আসে তারপর এখানেই থেকে যায় । এখন ওরা দ্বীপান্তরের বাসিন্দা ।

সতীর মিষ্টি মুখ ও ব্যবহার তার ভালোলেগে যায় ও বিয়ে হয় দেখে শুনে । মেয়ের হাইট বেশ কম কিন্তু

প্রেমের বাণ ; ঠিক প্রেম নয় তবুও প্রেম । তা যাইহোক ওদের ছেলে সুহেল বেঁটে নয় । স্বাভাবিক ও সুন্দর । সুস্বাস্থ্যের অধিকারি ও বাবার মতন দরাজ দিল । সতীর শত্রুদের রাগ বাড়ে । সুহেলের বাবা অবশ্যি খুব যে লম্বা তাও নয় । বেঁটের দিকেই।

সতীর বিয়ে হওয়াতে রাগ প্লাস সুস্থ ছেলে হওয়াতে রাগ প্লাস ছেলে ভালো ভাবে নিজের পায়ে দাঁড় হওয়াতে রাগ ।

এত রাগ যে বলার নয় । তবুও তারা সভ্য সমাজে থাকে তাই মুখে একটা ভদ্রতার মুখোশ পরা থাকে আর জীবন কাটাতে গেলে তো একা একা চলা যায়না তাই স্বাভাবিক সম্পর্ক টেনে চলে কিন্তু দরজা বন্ধ হলেই শুরু হয় নিন্দা মন্দ । তাতে কি সে তো পেছনে লোকে রাজার মাকে, বৌকেও চোর বলে !

তবুও সতী কিন্তু সবসময় মুখে মিষ্টি হাসি নিয়ে লোকের সাথে মেশে । জন্মদিনে , বিবাহ বার্ষিকীতে সবকিছুতেই সবাইকে নিমন্ত্রণ করে । মিলেমিশে থাকে । লোকের উপকারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং একটি বাঙালী সংস্থাও চালায় । সেখানে পুজো হয় , নাচ গান হয় ,

কবিতা কম্পিটিশান হয় , নাটক হয় , খাওয়া দাওয়া হয় । খুবই চমকপ্রদ ব্যাপার স্যাপার ও মধুমাখা লগ্ন কাটে সতীর জন্য । তাই মুখের ওপরে রেগে গেলেও কেউ বাঁটকুল অথবা বামন বলেনা । ঢিলে মারা তো অনেক দূরে ।

বাঙালী কালো হতে পারে , গরীব হতে পারে , তুখোর ব্যবসাদার না হতে পারে কিন্তু বাঙালী তো বোকা নয় ! আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না যে বাঙালী বুদ্ধু বা হাঁদা । তাই সতীর পিঠে চেপে দিব্যি কাটে দিন । এই পরবাসে সমস্ত উৎসব একে একে কাটে সতীপীঠে ।

পরোপকারের ভূত ছেলের মাথায়ও চেপে বসে ।

কলেজ পাশ করে সুহেল ভালো চাকরি পেয়ে যেতো কারণ সে এম-কম পরীক্ষায় এত ভালো নম্বর পায় যে লোকাল কলেজে লেকচারার এর কাজ পেয়ে যায় কিন্তু লোকের উপকারের ভূত মাথায় চাপায় সে এক বন্ধুর সাথে সংস্থা খোলে কলেজের কাজ না করে । এই বন্ধুর একটা গল্প আছে । সে সুহেলের স্কুলের বন্ধু । বাবা লোকাল ব্যবসাদার । তবে ব্যবসাটা একটু গোলমেলে তাই লোকে খুব একটা সম্মান দেয়না ।

তবে পয়সা অঢেল । মাছের ব্যবসা করে ।

এই বন্ধুর সাথে যুক্ত হয়ে সুহেল একটা সংস্থা খোলে । মোটামুটি আয় হয় । মনের শান্তি পায় ।

বন্ধুটি খুব একটা মন্দ নয় তবে তার বাবা ও মা ভীষণ চামার । পয়সা ব্যাতীত কিছু চেনেনা ।

যথাসময় একজন কেল্টি সুন্দরীর সাথে ছেলের বিয়ে দেয় মোটা পণ নিয়ে । মেয়েটির গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণ তবে মুখটা সুশ্রী তাই লোকে নাম দেয় কেল্টি সুন্দরী । তার বাবাও ব্যবসাদার । লরির , ট্রাকের কিছুর একটা করে তবে প্রচুর প্রচুর কাঁচা টাকা কামায় । কেল্টিই একমাত্র সন্তান তাই বাবার সমস্ত সম্পত্তি সেই পাবে । কিন্তু এই বন্ধুর চামার পিতামাতা কেল্টির ঘাড়ে পাড়া দিয়ে সব আদায় করতে যায় এবং ব্যর্থ হয় । তখন তাকে দুর্নাম দিয়ে বিতাড়িত করে এবং ছেলের আবার বিয়ে দেয় । এখানেই খটকা লাগে সুহেলের । বন্ধুকে অনেকবার বোঝায় যে সে যা করছে তা অন্যায় । কিন্তু বন্ধুর নিজের মন ও মাথা আছে , সেইই বা শোনে কেন ? কাজেই দুই বন্ধুর মধ্যে সম্পর্ক জটিল হয় ও মধুরতায় ফাটল দেখা দেয় ।

সেই পরোপকারের সংস্থা বন্ধ হয় অচিরেই ।

ঠিক সেই সময় সুহেল অন্য দ্বীপে যায় ভাগ্যের সন্ধানে । তার কাজের অভিজ্ঞতা অনেক । তাই ভাবে কিছু একটা পেয়ে যাবে আর বেশ কয়েক বছর কাজ করে টাকা জমিয়ে নিজের জন্ম দ্বীপে ফিরে আসবে । কিন্তু যা ভাবা হয় তাই কি হয় ?

জীবনের গতি পাল্টে দেয় ভাগ্য চক্র ।

এমন কিছু মানুষ তার জীবনে এসে প্রবেশ করে যাদের না সে কোনোদিন চিনতো আর না তাদের নিয়ে তার কোনো উৎসাহ আছে ।

কিন্তু ছিঁনে জোঁকের মতন এই অপোগন্ড গুলো তার ব্যাপারে খবর নিয়ে নিয়ে তার সম্পর্কে , মায়ের সম্পর্কে অপবাদ রটিয়ে সব যেন ফালাফালা করে দিতে চায় ।

তাই হয়ত গুণীজন বলে গেছেন যে শহুরে মানুষ আর গ্রামের মানুষ ভিন্নধরণের হয় । তাদের মনের মাধুর্য্য একরকম তো নয়ই বরং সুরের স্তর এতটাই আলাদা যে বীণা বাজিয়ে যাওয়াই মুস্কিল । সময়মতন না থামতে পারলে অবক্ষয় ও বিপর্যয়

অবশ্যম্ভাবি ।

আমরা এবার সুহেলের আলো ও ছায়া এই দুই অস্তিত্ব নিয়ে সুরের হোরি খেলবো ।

পাঠক পড়তে থাকুন । সঙ্গে থাকুন । লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন ।

সুহেল আলো :

চারিদিকে এত রোশনাই এত আশা

তবু কেন মন ভরে যায় ব্যাথায় ,

এত হতাশা !

সুহেল ছায়া :

মায়ের সুখেই আমার সুখ

মায়ের গলা শুনলেই ভরে যায় বুক ।

আলো :

এসেছি নতুন জগতে কাজের খোঁজে

এখানে সবই নতুন , হৃদয় কি সব বোঝে ?

ছায়া :

মাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়

একা একা মা পাবেনা তো ভয় ?

একটা সুহেল হল সে নিজে , অন্যটি তার মায়ের মনে আঁকা সুহেল অর্থাৎ তার ছায়া ।

আলো : আজব এক কাজের কথা শুনি ভাই

এমন কাজ বুঝি দুনিয়ায় কিছু নাই ।

ছায়া : কতদিন হল মা বলে বাবা গেছে দূরদেশে

কাঁদেনা মা তবু , বলে সব হেসে হেসে ।

পুত্র ও পুত্রী কখনো কি আর মাকে ছেড়ে যায় ? দূরদেশে গেলেও তারা মনে মনে মায়ের আঁচলেই থাকে ।

আলোর একটি বেণু হয়ত বেরিয়ে যায় বাইরের জগৎ এর দিকে সবকিছু অনুভব করতে কিন্তু মায়ের অন্তরে থেকে যায় সন্তানের ছায়া । চিরটাকাল । ছায়া বড় স্নিগ্ধ , তাই না ?

প্রখর রোদের তাপে মানুষ গাছের ছায়ায় বসেই তো জিরায় , নয় কি? আজ হয়ত এয়ার কন্ডিশনার বার হয়েছে কিন্তু বৃক্ষের ছায়ার তুলনায় এসব কিছুই নয় । গাছের শীতল ছায়ার তাপমাত্রা হয়ত কমানো

কিংবা বাড়ানো যায়না কিন্তু শরীরের মধ্যে এক পরম শান্তি নিয়ে আসে এই অকৃত্রিম মিঠেল ভাব ।

সুহেল দেখে যেই এলাকায় সে কাজের জন্য গেছে সেখানে মানুষ তাদের দেহটা নিয়ে ভীষণ ভাবে । তারা যেমন নিজেদের পেট ভরে গেলে ঘুরতে বেড়াতে যায় , শখ ও আবদার মেটাতে ভালোবাসে সেরকম এইসব অঞ্চলের মানুষেরা নিজেদের দৈহিক আকাঙ্খা নিয়ে অসম্ভব ভাবে ।

টিপটপ্ থাকা , ঘরদোর পরিপাটি করে রাখা ও তাই নিয়ে অন্যদের টিপ্পনী কাটা , বাগিচার শোভা বৃদ্ধির নামে মাটি ও সবুজ সরিয়ে প্লাস্টিক ও ধাতুর কবলে ফেলে বাগানকে গলা টিঁপে মারা , সামান্য জিনিস নিয়ে মানুষে মানুষে কলহ এসব খুবই সাধারণ ব্যাপার এদের মধ্যে ।

এদের বাড়িতে গাছ নেই । প্লাস্টিকের গাছে সজ্জিত । এরা জলপান করেনা । অবাক জলপান এদের । কোক বা পেপসি নামক সরবৎ খেয়ে থাকে অথবা হাল্কা মদ । এরা মেয়েমানুষ বা পুরুষমানুষের ভেদ করেনা । সবাই সবরকম পোষাক পরে ও কাজ করে । মেয়েরা এন্তার ধূমপান করে । বক্ষ প্রদর্শন

করে । স্তন দুটি যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় ; উপচে পড়ে বক্ষ থেকে । পুরুষের পশ্চাৎ দেশ উন্মুক্ত । দুটি পাছা তাদের প্যান্টের ওপর দিয়ে মেয়েদের স্তনের মতন উঁকি মারছে ।

এদের সমাজে ছেলে ছেলেকে বিয়ে করে ও মেয়ে মেয়েকে বিয়ে করে । তারপর কিসব উপায়ে ওরা সন্তানের জন্ম দেয় । কিসব ব্যাঙ্কে ওদের ডিম রাখা থাকে সেখান থেকে অন্য কোনো পুরুষ বা নারীর ডিম ধার করে বা কিনে ওরা মা হয় ।

আজব সমাজ । গান বাজনার নামে ধাতব জিনিস পিটিয়ে উৎকট চিল্লিয়ে পাড়া মাথায় করে । না আছে সুর না কথার মাধুর্য্য । গান শুনলে মন ভালো হবার কথা কিন্তু এদের গান শুনলে লোকে পাগল হয়ে যায় । এদের সমাজে কম বেশি সবাই উন্মাদ । ওষুধ খেয়ে কাজ করে ।

কারো ডিপ্রেশান , চুপ করে বসে থাকে আবার কারো কারো অ্যাগ্রেশান চাকু নিয়ে মারতে ছোটে ।

ভাই ভাইকে খুন করে । বোন বোনের বরের সাথে শুয়ে পড়ে । কেউ কাউকে বিশ্বাস করেনা ।

মদ , গাঁজা , মাদক দ্রব্য শিশুরাও খায় ।

এখানে উচ্ছৃঙ্খলতা ও বেলেল্লাপনার নাম আধুনিকতা । টাকা দিয়ে সব কেনা যায় । এমন কি টাকা দিলে খুনের আসামির বদলে অন্য কেউ জেল খেটে আসে ।

আলো সুহেল খুবই অবাক হয় ।

এখানে মরণের পরে কেউ কাঁদে না । সবাই মিলে একসাথে বসে মদ্যপান করে ও উৎসবের মতন কিছু করে হাসি ঠাট্টা করে থাকে । বলে যে যাবার সে তো চলেই গেছে আর দু:খ করে কি হবে ?

মোট কথা সুহেল দেখে যে এখানে আবেগ বলে মানুষের যে বস্তুটি আছে তা মৃত ।

এখানে আবেগ প্রবণ মানুষকে নিয়ে লোকে হাসাহাসি করে । সবাই মেশিনের মতন কাজ করে চলেছে । আসলে এরা সবাই অমর হতে চায় । এখানে কেউ মরেনা । যারা মরে গেছে বলে সুহেলেরা মনে করে তাদেরকে এখানে স্থবির বা অচল অবস্থায় আছে বলে ধরা হয় ।

মনে করা হয় যে এদের অসুখের ওষুধ বার হলেই তা এদের দেহে প্রয়োগ করা হতে পারে ও এরা বেঁচে উঠতে পারে ।

তাই এদের সমাজে কেউ মরেনা ।

এদের শ্রাদ্ধ শান্তি হয়না । এদের কোনো দেবদেবী নেই । মনে করা হয় সকলে দেহ নিয়ে জন্মায় মায়ের গর্ভ থেকে ও দেহ শেষ হলেই সব শেষ । হয়ত কোনো শক্তির স্ফুলিঙ্গ অন্তঃরীক্ষে মিশে যায় বা কিছুই হয়না ।

নাইট্রোজেন নামক রসায়নের তরলে মানব দেহগুলি চুবিয়ে রাখা হয় । বহু বছর ধরে এইভাবে রেখে দিলে পরে কখনো হয়ত এরা জীবিত হয়ে যেতেও পারে বলে লোকে ভাবে তাই পোড়ানো বা কবর দিয়ে শরীর নষ্ট করেনা কেউ ।

এমন আজব কান্ড দেখে মরমে মরে যায় সুহেল ।

পুরো জিনিসটাই তার কাছে আবেগ বর্জিত একটি ঘটনা বলে মনে হয় । মনে হয় মানুষকে মেশিনে পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছে । তার আলো কেমন যেন ফিকে হয়ে আসে ।সুহেল কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে । এই যে এত সুন্দর সুন্দর সব গল্প কথা পড়েছে পরী , দত্যি দানা , যক্ষ ইত্যাদির সবই তাহলে মিথ্যে ?

মুণি ঋষিদের শিক্ষাও মিথ্যে ? আআরাম খাঁচা ছাড়া হলেই মানুষ ও পশুপাখি মরে যায় এইসব তথ্য

সবই মিথ্যে তাহলে ? কিন্তু কিসের আশায় যুগ যুগ ধরে লোকে এগুলো প্রচার করে এসেছে ? সবাই ঠগ্ ? জোচ্চোর ? তান্ত্রিকরা তো শব সাধনা করে , মরা মানুষ জ্যন্ত করতে সক্ষম । কৈ তারা তো দেহকে যন্ত্র বলেনা ! ওরাও তো ভূত প্রেত আত্মার কথাই বলে ?

খুবই অবাক হয় সুহেলের আলো সত্ত্বা । হতাশ হয়ে পড়ে । এতদিন নিজেকে একজন শিক্ষিত মানুষ ভাবতো । এখন দেখতে পাচ্ছে যে সে কেবল অশিক্ষিতই নয় তার পুরো চেতনাই আবর্জনায় ভরা ।

হঠাৎ কোথার থেকে একটি মাছরাঙা ছোট একটা মাছ মুখে নিয়ে বসে একটি ভাঙা গাছের মোটা , শুকনো ডালে !

ওকে দেখে সুহেলের মনে হয় যেন কলের পুতুল । কেউ তাকে দম দিয়ে চালনা করছে ,প্রাণ বেরিয়ে গেলে ওকে তরল নাইট্রোজেনে রেখে দিলেই হয়ে গেলো । ও মরবে না আর ওর শিশুরাও কাঁদবে না । মাছরাঙার শ্রাদ্ধ হবেনা । এরকমভাবে জগতে কত মাছারাঙা থাকবে ? একটা সময় পৃথিবী থেকে গড়িয়ে পড়ে যাবে । নিচে । বায়ুমন্ডল ভেদ করে টুপ টুপ করে পড়বে নক্ষত্র মন্ডলের ওপরে ।

তখন কেমন হবে ?

নতুন নতুন মাছরাঙা যখন জন্মাবে তখন তারা কোথায় থাকবে ?

আকাশে একটা রামধনুও দেখা যাচ্ছে । মনে হয় আশা আছে । এই অমরত্বের দেশে যেখানে কেউ মরেনা সেখান থেকে সুস্থ সমাজে ফেরার আশা হয়ত আছে অত্যাধুনিক মানুষের । তাই ঐ ইন্দ্রধনু !

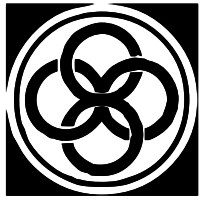

সুহেলের ছায়া সত্ত্বা তার মায়ের কাছেই থাকে তাই সুরক্ষিত । আনন্দে আছে । তবুও সে দেখতে পায় নানান কিছু । যেমন ওদের ওখানে এক পরিত্যক্ত খনি আছে । সেখানে আজও নাকি পাথর ও মাটি ছেঁচে তুললে সোনা ও তামা বার হয় । বহু মানুষ সেসব করে । তাই বিকিকিনি করে সংসার চালায় ।

ইদানিং এক খনিজ মাফিয়া ওসব ব্যাপারে নাক গোলানো শুরু করেছে ; তাই সমস্যা শুরু হয় ।

যদিও মালিকানা কারো নয় তবুও সেই শয়তান জোর খাটিয়ে লোককে পথ ভ্রষ্ট করে নিজে সবকিছু হাতাতে চায় ।

ছায়া : মা বলে গেলো গেলো

একি হলো বাছা আমার শোন

গরীবের সোনাদানা সাত রাজার ধন

সব গেলো শয়তানের কূট চালে আমরণ ।

এই এলাকায় তাই মৃত্যুর দূত হানা দিয়েছে। সোনা ও তামার খনির আশেপাশে মাটি ছেঁচে এইসব বহুমুল্য বস্তু যোগাড়ের প্রচেষ্টায় মানুষ হানাহানি করছে।

লাশের লাইন লেগেছে। ফসলের ক্ষেতের পাশে মানুষের লাশ।

ছায়া সুহেল দেখছে দুই চোখ ভরে সেসব দৃশ্য।

করোটির টুকরো, রক্তনদী, দেহের ছিন্ন ভিন্ন অংশ পড়ে আছে এলাকা জুড়ে।

এখানে মৃত্যু ভয়াল আকার নিয়েছে।

কেবল শব আর শব।

এদের শরীরের এত্তোগুলো টুকরো হয়েছে যে জড়ো করে সেলাই করতে পারবে না কোনো বাবা মুস্তাফা। সেই আলিবাবা ও কাশেমের গল্পের মতন।

এইসব দেখে দেখে মাফিয়ার বৌ পিলু মৃত্যুর কবিতা লেখা শুরু করেছে।

মেয়েটি গুণী। বরের মতন নয়। নাম পিলু ঠাকুরাণী। মাফিয়া হল কন্দর্প কান্তি ঠাকুর।

পিলু প্রতিটি মানুষ যারা খুন হচ্ছে তাদের নিয়ে মৃত্যুর কবিতা লিখেছে ।

কবিতা -১

মরণ , তোমাকে বুঝিনি আজও

তুমি রোজই ছুঁয়ে থাকো আমাদের

তবুও আজও কেউ তোমাকে বুঝতে পারেনি

কেন ? মরণ ? কেন কেন কেন ? বলো মরণ সন্ন্যাসী ? তুমি ঝটিকা সফরে আসো আর তুলে নিয়ে যাও তোমার প্রিয় পুষ্পগুলি ,

যারা আমাদেরও অতি প্রিয় ছিলো !

কবিতা-২

চারিদিকে শুধু দেখি মৃত্যুর মিছিল

ক্লান্ত চরণে আমি পিলু বসি জানালার পাশে

আবার ধেয়ে আসে মৃত্যু দূত আমার দিকে

আর একটা বড় মাছি , কতদিনের পুরনো লাশ

লাশকাটা ঘরে পড়ে ছিলো

মাছিরা আনন্দে আছে , পিলু বড় দুখী

মৃত্যু আসবেই চুপি চুপি

পিলু কাঁদবে পাঁজর ফাটিয়ে

সে তো মধুমক্ষী নয় যে আসর মাতাবে ।

কেন লিখছে তা সবাই বুঝেছে কারণ সে সংবেদনশীল । কিন্তু তার পতিদেবই এইসব হত্যা করছে । লোকে অবশ্যি বলে যে সে ধর্মপরায়ণা তাই মাফিয়াকে কেউ বন্দী করতে পারেনা ।

সে কন্দর্পকান্তিকে ছেড়ে চলে যেতেও চেয়েছে কিন্তু লোকটি দোর্দন্ডপ্রতাপ ।তাই বৌকে শিকলে বেঁধে রেখেছে । তবুও পিলু কবিতা লিখছে ।

পিলুর স্বামী নাকি তাকে নিজের হাত কেটে সিঁদুর পরিয়ে বিয়ে করেছিলো । লোকটি অত্যাচারি ও লম্পট কিন্তু বৌ তার এই একটিই ।

এদের বয়স কম নয় । মাফিয়া হল সত্তর উর্দ্ধ আর পিলু ৬৩/৬৪ । কিন্তু এদেরকে দেখলে মধ্য ত্রিশের বেশি কেউ বলবে না ।

নিয়মিত যোগাসন করে । নিরামিষ ভক্ষণ করে ও নানান তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রের কেরামতি জানে যার সাহায্য নিয়ে বয়সকে নিজের কেড়ে আঙুলে বেঁধে রেখেছে এই দম্পতি । তাদের দেখলে কেউ বলবে না তারা যথেষ্ট বয়স্ক ।

পিলুর পতিদেবের নাম কন্দর্প কান্তি হলেও লোকে তাকে লালঠাকুর নামে ডাকে । লোকটির স্ত্রী পিলু দেবী এবং একমাত্র পত্নী হলেও তার একটি উপপত্নীও আছে । সে থাকে নগরের বাইরে এক অট্টালিকায় । মাফিয়া এক নরখাদক হলেও তার চরিত্রেও অনেক ভাঁজ । সে সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছে এবং উচ্চস্তরের ব্রাহ্মণ বংশে ।

কিন্তু মানুষ মারা তার কাজ । আবার অন্যদিকে সে শিবের পুজো করে ভস্ম দিয়ে । সারা দেহে ভস্ম মেখে পুজো করে । আরতি করে ।

তার স্ত্রী অত্যন্ত ভক্তিমতী । হয়ত তাই আইন তাকে ছোঁয়না । অর্থাৎ পারেনা । লোকে বলে ।

একটা দৈব রক্ষাকবচের মতন আরকি ।

তবে লোকটি ব্রাহ্মণ হলেও তার উপপত্নী দলিত ঘরের সুন্দরী । খুব যত্নে রেখেছে তাকে ।

নিজস্ব ব্রাহ্মণত্ব বজায় রেখেই তাকে সযত্নে লালন পালন করেছে। মেয়েটির নাম লালিয়া।

ইংলিশ জানা লোকেরা বলে , লালঠাকুর রেজড্ লালিয়া লাইক আ পমেরিয়ান ডগ্ ।

কন্দর্প কান্তিকে লোকে লাল ঠাকুর বলে ডাকে । লালিয়ার বাসার নাম লাল কোঠি । তার লাল আরকি ।

লালিয়ার বাসাটি দেখতেও লাল রং এর আর তার চারদিকে লাল লাল ফুলের গাছ । আশ্চর্য লাগে দেখতে ।

তাই নাম বদলে গেছে মাফিয়ার ।

মাফিয়ার আরও কিছু ভালো গুণ আছে ।

সে শ্রাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পারদর্শী । এতটাই ভালোলাগে তার এই উচ্চাঙ্গের গান যে প্রথমে স্থির করে যে বেগম আখতারকে বিয়ে করবে । কিন্তু সে তো সম্ভব নয় তাই শেষমেশ বিয়ে হয় পিলুর সাথে যে খুব ভালো গাইতে পারে । খেয়াল, ঠুংরী , গজল সবেতেই পটিয়সী । নাম তাই রেখেছে পিলু তার বাবা কারণ ওদের বাড়ি হল সঙ্গীতের কোটর ।

সবাই গান জানে ও চর্চা করে । এছাড়াও লালঠাকুরের আছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অর্থাৎ কিনা

জড়িবুটিতে অসম্ভব দক্ষতা । একজাতের ভেষজ চিকিৎসক বলা চলে তাকে । কঠিন ব্যামো নিয়ে লোকে তার শরণাপন্ন হয় । এসব নিয়ে হার্বাল ব্যবসা চালায় তবে দরিদ্রদের বিনা পয়সায় ওষুধ ও শিকড় বাকড় দেয় তাতে নাম কামিয়েছে । এছাড়া পাথর , খনিজ দ্রব্য নিয়েও কারবার করে । এসবও চিকিৎসায় লাগায় । কাজেই এই নিয়েই গোলমাল হয় সাধারণ মানুষের সাথে । তবে সে কাউকে এমনি মারেনি । এক সাংঘাতিক মানুষখেকো বাঘ নাকি ঐ খনিজ যেসব এলাকায় মেলে যেমন সোনা ও তামা সেখানে হানা দিয়েছে ।

বাঘটি বিশাল । তার আরেক সাথী আছে । এই দুই বাঘের ভয়ে লোকে কুপোকাৎ । অনেক মানুষ তার কবলে পড়ে মারা গিয়েছে । কেউবা বাঘের হাত থেকে বাঁচতে অস্ত্রাঘাতে মরেছে এই হল ঘটনা ।

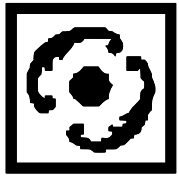

অন্দর মহলের সংবাদ হল, লালিয়ার সাথে বেগম পিলুর বনে কিন্তু লালিয়া পিলুকে সহ্য করতে পারেনা । লোকে বলে আঙুল ফুলে কলা গাছ । আদিবাসী মেয়ে ব্রাহ্মণ ঘরে ঠাঁই পেয়েছিস মিলেমিশে থাক তা নয় ঝগড়া করছে ।

পিলু কিন্তু তাকে নিজের বোন মনে করে কিন্তু লালঠাকুর দুজনকে দূরে দূরে রাখে ।

সে জানে আগুন আর ঘি পাশে না থাকাই ভালো ।

দুজনে দু জায়গায় থাকে । পুজো পার্বণে দেখা হয় যদিও পিলু যোগাযোগ রাখতে ইচ্ছুক ।

লাল ঠাকুর দুজনকে তুই করে সম্বোধন করে ।

বলে- কেন তুই ওর সাথে মাখামাখি করবি ? পারবি ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে একটা দলিতকে সহ্য করতে ?

পিলু- কেন তুমি তো ওকে বিয়ে করেছো ?

-- ধম্মো মতে নয় এমনি সিঁদুর পরিয়ে । তা আমার কথা আলাদা , ও আমার বৌ । তোর তো সতীন ।

- সতীন কি গো ? ও তো আমার বোন !

- আরে বোন ! পুরুষ মানুষের কিছু চাহিদা আছে তাই ও আছে তোর কি ঠেকা পড়েছে যে ওকে সারাজীবন আঁকড়ে থাকবি ?

পিলু কিছু বলেনা । চুপ করে থাকে । শুনেছে লালিয়া তার ওপরে খাপ্পা । কেন সে জানেনা ।

এমনকি পিলুর সন্তানদেরও সে ঘৃণা করে । পিলু কিন্তু তাকে অথবা তার সন্তানকে ঘৃণা করেনা ।

লালিয়াকে নিজের বোনের মতন মনে করে ।

যদিও পিলু তার স্বামীকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনার অনেক চেষ্টা করেছে ও ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়েছে লালিয়া কিন্তু এরকম কোনো চেষ্টা তো করেইনি বরং তার চাহিদা লালঠাকুরকে একপ্রকার আরো নিচের দিকে ঠেলে দিয়েছে ।

দলিতেরা যে এতদিন পদদলিত হয়েছে লালিয়া তার প্রতিশোধ নেয় । পিলু ভক্তিমতী তাই লালিয়া তাকে ঘৃণা করে । ধর্মের নামে মানুষকে হেয় করা

এই ব্যাপারটাকে ইনিয়ে বিনিয়ে সামনে এনে পিলুকে নানান ভাবে হেনস্থা করে লালিয়া ।

তাই লালঠাকুর এদেরকে দূরে রাখে কারণ দুজনকেই তার প্রয়োজন । একজন তার প্রাণ বাঁচাবে অন্যজন দেহ । তাই নিজেকে বাঁচাতেই কন্দর্প কান্তি এই বিভ্রান্তি থেকে দূরেই বাস করতে চান ।

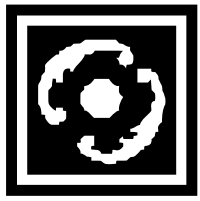

এদিকে ছায়া সুহেলের অবয়ব দেখে তার সুগ্রন্থিত মায়ের ডাক পড়ে পিলুর পিলি কোঠিতে ।

হ্যাঁ , বন্ধুরা পিলুর অট্টালিকার নাম পিলি কোঠি ।

লালিয়ার লাল কোঠি আর পিলুর পিলি কোঠি ।

এখানেই সুহেলের তথাকথিত খাটো মায়ের ডাক পড়ে । কারণ তার মা শৈশব থেকেই পশু পাখির কথা বুঝতে পারে । তাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম । দেখেছে তারাও কত কি বোঝে এবং সংবেদনশীল ।

পিলুর যেন সন্দেহ হয় বাঘের ব্যাপারে । হয়ত মৃত্যুর মিছিল দেখে অথবা ধ্যানে কিছু ঠাওর করে । এই হিংস্র বাঘ দুটি কেন এত মানুষকে খুবলে খাচ্ছে ? আর লালঠাকুর কেবল পয়সার লোভে এইভাবে মানুষ মারছে । একের পর এক । কেবল সোনা ও তামার কুচির লোভে । পিলুদের অনেক আছে আর কিইবা প্রয়োজন ? থাকনা এইসব বহুমূল্য সোনার কুচি সেইসব মানুষের জন্য যারা

এগুলি বিকিকিনি করে তা থেকে নিজেদের জীবন চালায় । আর সরকার তো বলেনি যে এইসব খনিজ বস্তুগুলো সরকারের ! তাহলে ?

কিন্তু পিলুর মতন সবাই তো ভাবেনা ।

লালঠাকুরকে প্রশ্ন করতে উনি বলেন , আরে ওসব জংলী বাঘের হাতে মরছে । কতগুলো ছোটলোকের বাচ্চা । বাঘের থাবায় আছাড় খাচ্ছে । তা আমি এর কি করি বল গিন্নী ? আর তোর মন যুগিয়ে চলতে

গেলে তো পথে বসতে হবে আমাকে আর আমার ছেলেপুলেদের ।

লালিয়ার সাথেও যোগাযোগ করেছিলো পিলু । সেও প্রায় একই কথা বলেছে , আরে পিলুদিদি ওসব বস্তির লোকের কাজ । মাটি ধুয়ে ধুয়ে সোনা আর তামা বার করছে আর বিক্রি করছে বাজারে । ওদের মধ্যে কয়েকটা বাঘের পেটে গেছে ।

তা তুমি এতো ভাবছো কেন এসব নিয়ে ?

এরা সংখ্যায় অনেক । কিছু মরলেও কমবে না সহজে । বলে হ্যা হ্যা করে হেসে ওঠে ।

লাল কোঠির বাসিন্দা হওয়ার আগে নিজের জীবনটা যেন রবার দিয়ে মুছে ফেলেছে পুরো ।

পূর্বাশ্রম ভুলে গিয়েছে । লালিয়া ; লালঠাকুরের রক্ষিতা নয় যেন কোনো মহর্ষির শিষ্যা একেবারে ।

তবে লালঠাকুরের এলেম আছে । রক্ষিতার সন্তানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন । নিজের নাম দিয়েছেন । বলেছেন পরবর্ত্তীতে বিদেশে পাঠিয়ে পড়াবেন ।

ভাবা যায় ? কেবল মাফিয়ার পুত্র এটা যদি মেনে নাও । তবে এই অঞ্চলে লালঠাকুর হল বিজনেসম্যান ও সোসাল ওয়ার্কার । তাকে মাফিয়া

বলে এমন সাহস কার ? **আপনি মাফিয়া নাকি সব সাফ কর দিয়া ? ইনি দুই নম্বর টা ।**

আভিজাত্য তত নেই এই মাফিয়ার তবে হৃদয়ে ঊষ্ণতা তবুও আছে । সাহস আছে । ঐ যে বলে সবাই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট নয় ।

এই মৃত্যুপুরীতে সুহেলের মা এলো পশুর ভাষা বুঝতে । বাঘে কী বলে , কী খায় , কেন খায় ইত্যাদি । আর তাতেই হল কাল ।

কথায় বলে বেশি জানলেই অমঙ্গল ।

যতটুকু তোমার জন্য রয়েছে ততটুকুই ভক্ষণ করো । বেশি খেলে অসুস্থ হবে । এক্ষেত্রেও তাই হল । ঘুমপরীর দেশ থেকে বেশি কেক খেয়ে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লো সবাই ।

সুহেলের মা ,সতী --যার তিন বছর বয়স থেকে এই বিশেষ ক্ষমতা লক্ষ্য করেছে তার বাবা ও মা তাহল পশুপাখির সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারা ও মাখামাখি করতে পারা মানুষের মতন সেই ক্ষমতা বলে সতী জানতে পেরেছে যে এই দুই বাঘ

আদতে বাঘই নয় । তারা রোবট । অত্যাধুনিক রোবট যুগল । রোবট দম্পতি । আশ্চর্য সুন্দর দেখতে পুরো সত্যিকারের বাঘের মতন । কিন্তু নড়াচড়া ও হুঙ্কার শুনলেও কেউ বলবে না এরা নকল । এতই নিঁখুত এই দুই বাঘ ও বাঘিনী । এদের কিনে আনা হয় এবং খনিজ দ্রব্য যেখানে মেলে সেখানে ছেড়ে রেখে ; লোককে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে জায়গা দখল করা হয় । বহু মানুষকে বিষাক্ত বাঘের নখের আঁচড়ে মারা হয় যা আদতে মানুষের কীর্তি ।

লালঠাকুরের দলই এই কান্ড ঘটিয়ে চলেছে ।

কিন্তু সতী ছোট্টবেলা থেকে এই ক্ষমতার অধিকারিনী । পিলু তা জানতো তাই তাকে বিশেষ সম্মান দিতো । লালঠাকুরও ।

রগচটা, অত্যন্ত পাশবিক লালঠাকুর সতীকে পছন্দ করতো ও স্নেহ করতো । **ঐ যে বললাম সবাই সাদাতে ও কালোতে নয় ।**

সতী পিলুকে বলে, লালঠাকুর-কে বলো না সখী আমার খুব ভয় লাগে ।

পিলু- নাহ্ , তোমার কথা বলবো না । তবে এই জিনিসটা যে আমি ধরে ফেলেছি সেটা ওকে জানাবো

আর ও আমাকে চটাবে না কারণ ও জানে আমার মধ্যে আছে ওর প্রাণ ভোমরা । দরকার হলে ওকে না জানিয়ে আমি সরকারকে চিঠি দেবো ।এমন শয়তানকে আর বেশিদিন শয়তানি করতে দেবোনা । **প্রয়োজনে দশমহাবিদ্যার ধূমাবতী মায়ের মতন নিজ স্বামীকে নিজেই ভক্ষণ করবো আমি আর তারপর বৈধব্য পালন করবো ।**

সতীকে কথা দিলো পিলু । ওরা দুজন দুজনকে সখী বলে ডাকে । দুজনের বাস সমাজের দুই মেরুতে , নগরের দুই সীমায় অথচ একটি সুতোয় যেন ওরা বাঁধা । সতীকে খুব বোঝে পিলু । আর ভালোও বাসে । আর পিলু একজন মাফিয়ার পত্নী হলেও সতীকে স্পর্শ করে থাকে সারাটাদিন ।

আলো সুহেল তো আর আসবে না, তার সতী মায়ের কাছে অথবা পরিবারের কাছে কোনোদিন ।

কিন্তু কেন এত অভিমান ?

অভিমান নয় দু:খ ।

ভীষণ দু:খ ।

ভয়ানক এক দু:খ ।

তার দেবী সমান মাকে এত অপমান করেছে তথাকথিত ভদ্র সমাজ । বলেছে যে তার মা এত খাটো, তাই সে ভোট দিয়েছে মানুষের তারুণ্যকে ধরে রাখার সম্পর্কে যে গবেষণা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে । কারণ তার মাও তাহলে তরুণী হবে এবং বামন তরুণী হয়ে বেঁচে থাকবে ও লোকের হাসির পাত্র হবে । কিন্তু সে এইভেবে বিপরীতে ভোট দেয়নি । তার কাছে কেউ একবারও জানতে চায়নি কেন সে ভোটটা পক্ষে দেয়নি ।

কারণ সে জানে যোগাসন করে তারুণ্য ধরে রাখা যায় । মুণিঋষিরা করে গেছেন । লালঠাকুর ও পিলু

মাসিমা ধরে রেখেছেন । ওদের ওখানে অনেকে ওসব শেখে ও চর্চা করে দেহকে সুঠাম ও রোগ মুক্ত রেখেছে । এর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খসিয়ে, ওষুধ খেয়ে শরীর খারাপ করার দরকার নেই ।

বরং যোগাসন শিখে নাও । ওষুধের কবলে পড়োনা । এর সাথে তার মায়ের কোনো সম্পর্ক নেই ।

তার মা, না কোনো কিছুর খামতিতে ভোগে না কোনো মানুষকে ছোট করায় উঠে পড়ে লাগে ।

তার মাকে প্রকৃতি হয়ত দৈহিক উচ্চতা ততটা দেয়নি যতটা দিলে সভ্য সমাজ উপযুক্ত মনে করবে কিন্তু এমন শক্তি দিয়েছে যাতে মা পশু পাখির ভাষা বুঝতে সক্ষম ও তাদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে । এমনই যে বনের বাঁদরের বাচ্চা জন্মালে মায়ের কোলে তুলে আশীর্বাদ নিয়ে তবে ওরা যায় । সাধারণত:বন্যপশুরা তাদের সন্তানকে মানুষ স্পর্শ করলে ফেলে দেয় ।

আর তার মা তো আর মিসেস ইউনিভার্স কন্টেস্টে নামছে না যে একেবারে উটপাখির মতন তাকে ঢ্যাঙা হতে হবে ?

আসলে আলো সুহেল যেই এলাকায় যায় সেখানে বিজ্ঞানের গবেষকেরা যৌবন ধরে রাখার জন্য এক গবেষণা করছে । বুড়োদের ধরে নিয়ে গিয়ে এক বন্দীশালায় বন্দী করে ; তাদের ওপরে নানান ওষুধ বিষুধ প্রয়োগ করে দেখা হচ্ছে যে তারা তরুণ হয় কিনা । সুহেল সেখানেই কাজ পায় । হিসেব নিকেশ দপ্তরে । এবং ভোটের সুযোগ পায় ।

আজকাল কেউ বৃদ্ধ বাবা ও মাকে চায়না । তাদের প্রয়োজন কেবল সন্তানদের মানুষ করা অবধি । তারপর গন্তব্য ডাস্টবিন ।

তাই অনেকেই মোটা টাকার বিনিময়ে বৃদ্ধ বাবা ও মাকে এইসব গবেষণাগারে দিয়ে আসছিলো বৃদ্ধাশ্রমের বদলে । বাইরে বুক ফুলিয়ে বলছিলো যে আমরা সায়েন্সকে হেল্প করছি । কিন্তু এতে বাবা ও মা অচিরেই মারা যাচ্ছিলো ও দায়ও কারো ঘাড়ে যাচ্ছিলো না । সবই রিসার্চের নাম । সাপও মরলো আর লাঠিও ভাঙলো না ।

আলো সুহেলের মায়ের জীবনের গল্প ভিন্ন । তাই আবেগে ভরপুর সুহেল মনে মনে স্থির করে যে নাহ্ , বাসায় ফেরা কদাচ নয় ।

মায়ের সামনে মুখ তুলে আর দাঁড়াতে পারবে না ।

তার কাছে মা হল মা । এক কোমল অনুভূতি । ফুলের মতন । মা কি কখনো বুড়ো হয় ? না কুৎসিত হয় ? নাকি বেঁটে , বামন হয় ?

মা তো মা-ই ? বাবা তো বাবা-ই ?

তাই না ।

আর সতী ?

সেও দেখো একই রকম । সুহেল এতদূর দেশে গেছে কিন্তু সত্যি কি সে তার মাকে ছেড়ে গেছে ? কোথাও ? তার ছায়া তো রয়েই গেছে তাই না ?

একটুকু অংশ তার মাকে ছুঁয়েই আছে ।

কোন মহামানব বলেছেন না ?

কুপুত্র যদিবা হয়, কুমাতা কদাচ নয় !

<u>মায়েরা কি কদাচ কুমাতা হয় ?</u>

মায়ের রক্ত মাংস দিয়েই তো গড়া সুহেল । বাবার ঔরস , উর্জা বা এনার্জি । নাহলে সুহেল কোথায় ?

এরা এত পর হয়ে গেলো কবে থেকে ?

এত কদর্য ? এত নির্দয় সমাজ হয়ে গেলো মাতাপিতার প্রতি ?একেবারে ডাস্টবিন ?

নিজেদের সুখ দু:খ সব বিসর্জন দিয়ে যেই বাবা ও মা সন্তানদের বড় করে তোলে তাদের সাথে এরকম ব্যবহার আর তারুণ্য লাভের গবেষণায় জোর করে ভর্ত্তি করে দেওয়া তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য এই ব্যাপারটা এক ধরণের ঘৃণ্য চক্রান্ত । সমাজের একটি কালো দাগ ।

অচিরেই মানুষের কিছু করা উচিৎ এই নিয়ে ।

অন্তত: সুহেল তার বাবা ও মাকে এই চোখে দেখে না ।

এইসব ছাইপাশ ভাবতে ভাবতে একটি ভিডিও এলো তার কাছে হোয়াটস্ আপে ।

মা নিজে শিখে নিয়ে ভিডিও তুলেছে ছেলেকে পাঠাবে বলে কারণ বহুদিন হল ছেলে যোগাযোগ করছে না ।

মায়ের করুণ মুখ ভেসে ওঠে --- বাবা , অনেকদিন কোনো খবর নেই । ভালো আছো তো ?

যদিও তোমার অর্ধেক অংশ আমার সাথেই আছে । আমার সাথে সব জায়গায় যায় । রোজ কথা বলে তবুও বাকি অংশটাও দেখতে ইচ্ছুক ।দ্রুত যোগাযোগ করো এস এম এস মারফৎ ।

পট করে ভিডিও বন্ধ করে দিলো সুহেল । দুই চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে ।তাহলে সে ভুলে গেলেও মায়ের কাছে তার ছায়া রয়েই গেছে ।মাকে কখনো ফাঁকি দেওয়া যায়না ।চুলোয় যাক্ , দুনিয়ার লোক কি ভাবছে তাই দিয়ে কি হবে ? সবাই যদি সবার মাকে সম্মান দেয় তাহলেই আর বুড়ো থেকে ছুড়ো হবার ওষুধ কারখানায় কেউ তাদের বৃদ্ধ বাবা ও মাকে ফেলে দিয়ে আসবে না । দুষ্টলোকের ব্যবসাও উঠে যাবে ।সেটাও ভোট না দেবার আরেকটা কারণ ।সুহেল মনে করে জগতে আরো অনেক সিরিয়াস বিষয় আছে যার পেছনে অর্থ ঢালা যেতে পারে যা মানুষকে সুস্থ ও সুন্দর জীবন দেবে **এইসব ফালতু খোদার ওপর খোদগারি ধরণের রিসার্চের পেছনে অর্থাৎ বনের মোষ তাড়ানোর পেছনে না দৌড়ে যেখানে অলরেডি এটা করা যায় যোগাসনের মাধ্যমে সুস্থ ভাবে।**

People need to be cautious because anything built by man can be destroyed by mother nature .

Russel Honore.

Every girl should use what mother Nature gave her before father Time takes it away .

Laurence J.Peter.

THE END